بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ মোতাবেক ০৭ তবলীগ, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

খায়বারের যুদ্ধের স্মৃতিচারণ চলছিল। মহানবী (সা.)-এর খায়বার অভিমুখে যাত্রার বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে ১৬০০ নিবেদিত প্রাণ লোকদের একটি সৈন্যদল মদীনা হতে রওয়ানা হয়। এতে দুইশত অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু যাত্রার পূর্বে মহানবী (সা.) একটি সংবাদ সংগ্রহকারী দল সম্মুখে প্রেরণ করেন যার কাজ ছিল সেনাদলের সামনে থেকে পথের দেখাশোনা করা এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর আনসারী (রা.)। খায়বারের পথঘাট চেনার জন্য দুইজন পথপ্রদর্শককে বিশ সা' খেজুরের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নেওয়া হয়েছিল। বিশ সা' অর্থাৎ পঞ্চাশ কিলো। তাদের নাম হাসিল বিন খারেজা আশজায়ি এবং আব্দুল্লাহ্ বিন নুআয়েম বলে উল্লেখ রয়েছে আর তারা উভয়ে আশজা'আ গোত্রের সদস্য ছিল। মদীনা হতে খায়বার অভিমুখে যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে বিরতি দিয়ে তারা 'সাহবা' নামক স্থানে অবতরণ করেন। সেখানে নামাযের সময় হলে নামায আদায় করে নেওয়া হয়। অতএব বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) 'সাহবা'-তে আসরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি (সা.) খাবারের জন্য কিছু চেয়ে পাঠান। সৈন্যদলের কাছে শুধুমাত্র ছাতু ছিল আর তিনি (সা.) এবং সাহাবীরা সেটিই গ্রহণ করেন। রেওয়ায়েতকারী বর্ণনা করেন যে, এরপর তিনি (সা.) মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ান আর তিনি (সা.) কুলি করেন এবং আমরাও কুলি করি। এরপর তিনি (সা.) নামায পড়েন, কিন্তু পুনরায় ওযু করেন নি। সাহবা এবং খায়বারের মাঝে বারো মাইলের দূরত্ব ছিল। সফরকালে এমন কিছু ঘটনাও ঘটে যা থেকে বোঝা যায় যে, এমন জরুরী অবস্থাতেও মহানবী (সা.) সাহাবীদের তরবিয়তের প্রতি কতটা খেয়াল রাখতেন আর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আনুগত্য এবং আদেশ পালনের মতো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকতেন। এ ধরনেরই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাতে সৈন্যদলের সামনে একটি উজ্জ্বল বস্তু চলমান অবস্থায় দেখা যায়। মহানবী (সা.) চিন্তিত হন আর খবর নিয়ে জানা যায় যে, ইসলামী সৈন্যদলেরই একজন যোদ্ধা ছিল যে সেনাদল থেকে বেরিয়ে সবার আগে আগে অগ্রসর হচ্ছিল। আর তার মাথার শিরস্ত্রাণ রুপা নির্মিত হওয়ায় তা চকচক করছিল। তার নাম ছিল আবু আবস। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হযরত আবু আবস বর্ণনা করেন যে, আমি একথা ভেবে শঙ্কিত হই যে, কোথাও আমার বিষয়ে কিছু অবতীর্ণ হয়নি তো, (কেননা) আমি ভুল করেছি। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সৈন্যদল ছেড়ে তুমি কেনো একা একা সামনে অগ্রসর হচ্ছিলে? যাহোক, তিনি তার কারণ তুলে করেন। মহানবী (সা.) তখন উপদেশ দিয়ে বলেন, সৈন্যদলের সাথেই চলা উচিত। এরপর মহানবী (সা.) তার সাথে কথা বলতে থাকেন। তিনি সেসকল অসহায় সাহাবীদের একজন ছিলেন যাদের কাছে এই যুদ্ধে আসার জন্য কোনো পাথেয় ছিল না আর তিনি মহানবী

(সা.) এর সকাশে এই বলে উপস্থিত হয়েছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার নিকট কোনো পাথেয় নেই আর আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য ভরণ পোষণের ব্যবস্থাও ঘরে নেই। তখন মহানবী (সা.) নিজের একটি চাঁদর তাকে দান করেন। এই বিজ্ঞ সাহাবী চাঁদরটি নিয়ে বাজারে যান এবং বলেন যে, এটি মহানবী (সা.) দান করেছেন আর আট দিরহামে সেটি বিক্রি করে দেন। দুই দিরহামে তিনি ঘরের জন্য খাদ্য সামগ্রি ক্রয় করেন, অর্থাৎ ঘরের খরচ পূরণ করেন, দুই দিরহামে পাথেয় নেন, আর বাকি চার দিরহাম দিয়ে নিজের জন্য একটি চাঁদর ক্রয় করে সৈন্যদলে এসে যোগ দেন। আলাপচারিতার মাঝেই মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি তোমাকে যে চাঁদর দিয়েছিলাম সেটি কোথায়? তিনি নিবেদন করেন, সেটি তো আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম। অতঃপর সেই পুরো বৃত্তান্ত শোনান যা এখনই বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) আবু আবস-এর এ কথা শুনে মুচকি হাসেন এবং বলেন, হে আবু আবস! তোমরা এখন অতি দরিদ্র। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি তোমরা জীবিত থাকো ও দীর্ঘায়ু লাভ করো তাহলে কিছুকাল পরেই তোমরা দেখবে যে, তোমাদের পাথেয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের কাছে দিরহাম ও দিনারের প্রাচুর্য হবে এবং দাস-দাসীরও আধিক্য থাকবে। কিন্তু এসব তোমাদের জন্য খুব উত্তম হবে না। হযরত আবু আবস মহানবী (সা.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছেন। আর তিনি বলতেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! সবকিছু ঠিক সেভাবেই হয়েছে যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছিলেন।

আবু আবস-এর পরিচয় হলো, তার প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল উয্‌যা। মহানবী (সা.) তা পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখেছিলেন। তিনি সত্তর বছর আয়ু লাভ করেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান এবং তাকে জান্নাতুল বাকী-তে দাফন করা হয়।

মহানবী (সা.) বনু গাতফানের নিকট সন্ধির বার্তাও প্রেরণ করেছিলেন। যেমনটি এখনই বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় 'সাহবা' নামক স্থানে বিরতি দেন এবং আসর, মাগরিব ও এশার নামায সেখানেই আদায় করেন। এ স্থানটি খায়বার থেকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। নামায আদায় শেষে তিনি (সা.) উভয় পথপ্রদর্শককে ডাকেন এবং নিজ রণকৌশল তাদের নিকট বর্ণনা করে বলেন, আমি এমনভাবে খায়বারে আক্রমণ করতে চাই যে, একদিকে খায়বারবাসী ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিবন্ধক হয়ে যাব, যেন তারা সেখান থেকে পালিয়ে সিরিয়ার দিকে না যেতে পারে। আর পাশাপাশি বনু গাতফান গোত্রের মাঝেও প্রতিবন্ধক হয়ে উঠব যেন তারা এই ইহুদিদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে। হাসিল নামক পথপ্রদর্শক সৈন্যদের নিয়ে রওয়ানা হয় আর এমন এক স্থানে পৌঁছে থেমে যায় যেখান থেকে বিভিন্ন পথ খায়বারের সেই উপত্যকা অভিমুখে যায়। মহানবী (সা.) তার নিকট সেই সমস্ত পথের নাম জিজ্ঞেস করেন। তখন সে হাযান, শাশ, হাতেব ইত্যাদি নাম বলে যা অর্থগত দিক থেকে সংকীর্ণতা, কঠোরতা এবং দুঃখ ও কষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করে। সে একটি নাম মারহাব বলে, যার অর্থের মাঝে আনন্দ ও প্রাচুর্য বিদ্যমান। তখন মহানবী (সা.) ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী শুভ লক্ষণ মনে করে এই মারহাব নামের পথটিকেই নির্বাচিত করেন। মহানবী (সা.) এই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন যে, বনু গাতফান খায়বারবাসীদের সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছে। আর এখন তারা অতিরিক্ত চার হাজার সৈন্য নিয়ে এ সংকল্পে বের হয়েছে যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনী খায়বারে

পৌঁছানোর পূর্বেই তারা পথিমধ্যে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর ওপর আক্রমণ করবে। বনু গাতফান তাদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবাজ সেনাপতি তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদ ও উয়ায়না বিন হিসনের নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার সৈন্য পূর্বেই খায়বার অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং তারা খায়বারের দুর্গে পৌঁছেও গিয়েছিল। আর এখন চার হাজার সৈন্য সংবলিত এ দল ইসলামী সৈন্যদলকে থামানো ও নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তাদেরকে নির্মূল করার জন্য পথিমধ্যে ছিল। মহানবী (সা.) বনু গাতফানের সাথে যোগাযোগ করেন আর তাদেরকে একটি পত্র প্রেরণ করেন যাতে তিনি লেখেন যে, তারা অর্থাৎ বনু গাতফান গোত্র যেন খায়বারবাসীদের সাথে ঘটিতব্য যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে। আর তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি খায়বারে আমাকে বিজয় দান করবেন। কতিপয় ইতিহাসবিদের মতে, মহানবী (সা.) এ বার্তাও দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ইহুদিদের সঙ্গ দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে খায়বার বিজয় করার পর (এটি) সেসব গোত্রকে দান করে দেয়া হবে। কতকের মতে, মহানবী (সা.) ইসলাম গ্রহণ করার শর্ত রাখেন নি, বরং এটি বলেছিলেন যে, তারা যেন খায়বারবাসীর সাহায্য না করে, শুধুমাত্র নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে (তারা যদি) সেখান থেকে সরে দাঁড়ায় তাহলে খায়বারের বার্ষিক উৎপাদনের অর্ধেক (ফসল) তাদেরকে দেয়া হবে, কিন্তু ১৬০০ মুসলমানের মোকাবিলায় পনেরো হাজার যুদ্ধবাজ সেনাদের সৈন্যবাহিনী এবং মজবুত দুর্গের দম্ভ তাদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল ছিল, যার কারণে তারা মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী মানতে অস্বীকার করে। তখন মহানবী (সা.) খাযরাজ গোত্রের নেতা ও নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে গাতফান (গোত্রের) সেনাপতি উয়ায়না বিন হিস্নের কাছে প্রেরণ করেন। সে বনু গাতফান (গোত্রের) ঐ এক হাজার সেনাদলের সেনাপতি হিসেবে তখন খায়বারে ইহুদীদের নেতা মারহাবের দুর্গে অবস্থান করছিল। উয়ায়না যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত সা'দ (রা.) এসেছেন তখন সে তাকে দুর্গের ভেতরে নিয়ে আসার সংকল্প করে যেতে উদ্যত হলে মারহাব আপত্তি করে আর বলে, মুসলমানদের এই প্রতিনিধিকে দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা সমীচীন নয়, পাছে তিনি দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের রাস্তা ইত্যাদি দেখে ফেলবেন। যদিও উয়ায়নার বক্তব্য ছিল, মুসলমানদের প্রতিনিধিকে আমি (দুর্গের) অভ্যন্তরে নিয়ে আসতে চাই যেন তিনি আমাদের সামরিক শক্তি ও প্রস্তুতির সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু মারহাব সম্মত হয় নি। তখন উয়ায়না হযরত সা'দ (রা.)-র সাথে দুর্গের বাইরে গিয়ে সাক্ষাৎ করে। হযরত সা'দ (রা.) উয়ায়নার কাছে মহানবী (সা.)-এর বার্তা পৌঁছে দেন যে, **'আল্লাহ্ আমাদেরকে খায়বার বিজয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন'**। কাজেই তুমি এখান থেকে ফেরত চলে যাও এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। খায়বার বিজয়ের পর (এখানে উৎপাদিত) পুরো বছরের খেজুরও তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। উয়ায়না তখন হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, আমরা কোনোমতেই আমাদের মিত্রদের পরিত্যাগ করব না আর তোমাদের ক্ষমতা কতটুকু তা-ও আমাদের জানা আছে। এই ইহুদীরা সুদৃঢ় দুর্গের অধিকারী আর এদের সেনাসদস্যও অধিক এবং অস্ত্রশস্ত্রও অনেক বেশি। তোমরা যদি মোকাবিলা করো তাহলে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে আর এরা কিন্তু কুরাইশের মতো নয়, যাদের বিরুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ করেছিলে। পাশাপাশি সে এটিও বলে যে, আমার এই বার্তা মুহাম্মদ (সা.)-কেও পৌঁছে দিও। হযরত সা'দ (রা.) তার এই দাম্ভিক উত্তর শুনে উয়ায়নাকে বলেন, **আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই এই দুর্গে তোমার কাছে আসবেন আর এখন আমরা তোমাকে**

যে প্রস্তাব দিয়েছি তখন তুমি আমাদের কাছে তা-ই চাইবে, কিন্তু তখন তুমি তরবারির আঘাত ছাড়া আর কিছুই পাবে না, অর্থাৎ তখন শুধু যুদ্ধই হবে। **হে উয়ায়না! আমি দেখেছি যে, আমরা মদীনার ইহুদীদের (বাড়ির) প্রাঙ্গনেও পা রেখেছিলাম আর তারা চরমভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।** একথা বলে হযরত সা'দ (রা.) ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। পাশাপাশি তিনি পরম নিষ্ঠার সাথে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং স্বীয় ধর্মকে জয়যুক্ত করবেন। তখন এই বেদুঈন অর্থাৎ উয়ায়নাকে একটি খেজুরও দেবেন না। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তরবারি যদি তাকে আঘাত হানে তাহলে সে এই ইহুদীদের ফেলে নিজের এলাকা অভিমুখে এমনভাবে পালাবে যেভাবে ইতঃপূর্বে খন্দকের যুদ্ধের দিন তারা পালিয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধেও এই গোত্র ছয় হাজার সেনাদল নিয়ে কুরাইশদের সাহায্য করতে এসেছিল, এরপর সেখান থেকে পলায়ন করেছিল।

ঐশী প্রতাপ ও গাতফান গোত্রের পালানোর উল্লেখও পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, نُصِرتُ بِالرُّعبِ অর্থাৎ, আমাকে ঐশী প্রতাপ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। এ ঘটনাটি কার্যত এখানে পুনরায় গাতফান সেনাদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হয়। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু গাতফানের চার হাজারের সেনাদল মুসলিম সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্ধাবন করছিল, যাতে এরা মুসলমানদের খায়বারে পৌঁছানো রোধ করতে পারে, কিন্তু এমন একটি ঐশী তকদীর প্রদর্শিত হয় যার ফলে গাতফান সেনাদল অকস্মাৎ পিছু হটে এবং নিজেদের বাড়ি অভিমুখে ফিরে যায়। ইতিহাস ও জীবনচরিতের গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ আছে যে, গাতফান গোত্রের সেনাপতি তার পিছন থেকে একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পায় যে, একজন সতর্ককারী তাকে উচ্চকণ্ঠে বলছিল, মুসলমানদের সেনাদল তাদের অবর্তমানে তাদের বাড়িঘর ও সম্পদ এবং গবাদি পশুদের ওপর আক্রমণ করেছে। আর তারা তাদের ধন-সম্পদ, নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করতে যাচ্ছে। তখন তারা তৎক্ষণাৎ ফেরত চলে যায় আর ইহুদিদের সাহায্য করতে পারে নি। এটি একটি অদৃশ্যের সাহায্য ছিল, আল্লাহ্ তা'লার (পক্ষ থেকে) আওয়াজ ছিল।

ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে গাতফানের সেনাবাহিনীর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেভাবে পূর্বেই একটি গ্রন্থের বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বনু গাতফানের এক হাজার যুদ্ধবাজ তাদের সর্দার উয়ায়না বিন হিস্‌ন-এর নেতৃত্বে খায়বারের ইহুদীদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাদের দুর্গে চলে এসেছিল। যদিও অন্যান্য জীবনীগ্রন্থে তাদের সংখ্যা এক হাজারের পরিবর্তে চার হাজার উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে কোনো কোনো জীবনীগ্রন্থে লেখা আছে যে, উয়ায়নার নেতৃত্বে বনু গাতফানের চার হাজার সৈন্যসংবলিত সেনাদল যখন খায়বার অভিমুখে আসছিল তখন পথিমধ্যেই মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধিদলের সাথে উয়ায়নার কথোপকথন হয় এবং ঐশী প্রতাপের দরুন মাঝপথ থেকেই এই চার হাজার সৈন্যসংবলিত সেনাদল নিজেদের বসতির উদ্দেশ্যে ফেরত চলে যায়। সীরাত ইবনে হিশাম-এ এটি এভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। যাহোক, মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং সন্ধ্যার আলো-আধারিতে যখন খায়বারের দুর্গ দেখা যাচ্ছিল তখন তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, দাঁড়াও। তখন সবাই দাঁড়িয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا
اَذْرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرِ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَقْدِمُوْا بِسْمِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, **হে সাত আকাশের প্রভু-প্রতিপালক! এবং প্রত্যেক সেই বস্তু যার ওপর সেগুলোর ছায়া রয়েছে, আর সাত পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক এবং যা কিছু তারা বহন করছে, আর শয়তানের প্রভু এবং যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে, আর বাতাসের প্রভু-প্রতিপালক এবং যা কিছু তা উড়িয়ে নেয়, হে আল্লাহ! আমরা এই জনপদের এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করি। আর এই জনপদ ও এর অধিবাসীদের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।** এরপর মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অগ্রসর হও।

অতঃপর মহানবী (সা.) যাত্রা করেন এবং মানযিলায় পৌঁছেন, এটি খায়বারের বাজার ছিল। যুদ্ধের পর এই বাজার হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-র ভাগে এসেছিল। তিনি (সা.) রাতের কিছু অংশ মানযিলা, অর্থাৎ খায়বারের বাজারে অতিবাহিত করেন। ইহুদীদের এই ধারণা ছিল না যে, মহানবী (সা.) তাদের ওপর আক্রমণ করবেন। কেননা ইহুদীদের নিজেদের দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সংখ্যাধিক্যের কারণে দম্ভ ছিল। ইহুদীরা যখন এটি জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) তাদের দিকে আসছেন, তখন প্রত্যহ দশ হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য সারিবদ্ধ হয়ে (দুর্গের) বাইরে বের হয়ে আসতো এবং বলতো, একটু দেখো তো, মহানবী (সা.) আমাদের বিরুদ্ধে সেনাভিযান পরিচালনা করবেন কিনা? এটি অসম্ভব। যখন মহানবী (সা.) তাদের নিকটে পৌঁছেন তখন তারা টেরও পায় নি, এমনকি সূর্য উদিত হয়। {অর্থাৎ মহানবী (সা.)} রাতেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। কাজেই, সকালে ইহুদীরা যখন তাদের দুর্গ থেকে বাইরে বের হয় তখন তাদের হাতে কোদাল ও ঝুড়ি ছিল, (কেননা) তারা নিজেদের কাজ করতে বের হয়েছিল। (কিন্তু) মহানবী (সা.)-কে দেখামাত্রই তারা দৌঁড়ে নিজেদের দুর্গে লুকিয়ে পড়ে।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) রাতের বেলা খায়বারে পৌঁছেন, কিন্তু সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের ওপর আক্রমণ করেন নি। (অর্থাৎ, রাতেই পৌঁছেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলা আক্রমণ করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না, সকাল হলে তাঁর (সা.) আক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল)। যখন সকাল হয় তখন ইহুদীরা তাদের কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে বের হয়। যখন তারা মহানবী (সা.)-কে দেখতে পায় তখন বলে, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.) এবং সেনাবাহিনী। মহানবী (সা.) বলেন, خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ। অর্থাৎ, খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন আমরা কোনো জাতির উঠোনে অবতরণ করি তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে তাদের প্রভাত মন্দ হয়।

মানযিলা-তে স্থায়ী শিবির করা হয় নি। ইসলামী সেনাবাহিনীর শিবির স্থানান্তরিত হয়। এই ব্যাপারে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বার পৌঁছলে তিনি (সা.) মানযিলা নামক স্থানে রাত অতিবাহিত করেন আর সেখানেই ভোর হয়। হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে আসেন এবং নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার এই স্থান অর্থাৎ মানযিলা-তে শিবির স্থাপন যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিছু বলব না। কিন্তু যদি এটি আপনার নিজের মতামত হয়ে থাকে তাহলে আমরা পরামর্শ দিতে ইচ্ছুক। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এই মতামত আমার। হযরত হুব্বাব (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তাদের দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে গেছেন আর তাদের বাগানগুলোর সম্মুখে রয়েছেন এবং এই ভূমি শুষ্ক। আর আমি নাতা'র অধিবাসীদের জানি, তাদের তির অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছায়। আর তিরন্দাজিতে তাদের সমকক্ষ কেউ নেই। আর তারা আমাদের চেয়ে উঁচু স্থানেও রয়েছে। তাদের তির আমাদের পর্যন্ত খুব সহজেই পৌঁছতে পারবে। আর তাদের রাতের আক্রমণ থেকেও আমরা নিরাপদ

নই। তারা খেজুরের ঝাড়েও লুকাতে পারে। অতএব, আমার নিবেদন হলো, আপনি এখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যান। তিনি (সা.) বলেন, তুমি ভালো পরামর্শ দিয়েছো। কিন্তু যা-ই হোক না কেন, আমরা আজ তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কিন্তু একইসাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে (রা.) ডাকেন, যিনি তাঁর (সা.) নিরাপত্তা দলের ইনচার্জ ছিলেন, এবং বলেন, তাদের দুর্গগুলো থেকে কিছুটা দূরে আমাদের জন্য স্থান সন্ধান করো। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) চলতে চলতে রাজী নামক স্থানে পৌঁছেন, যা খায়বার ও গাতফানের গোত্রগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আর এরপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ফেরত এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার জন্য একটি জায়গা দেখেছি। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের সাথে চলো। কিন্তু এর পূর্বে মহানবী (সা.) বলে দিয়েছিলেন যে, আজকে যুদ্ধ এখান থেকেই হবে। অতএব সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হবার পর পুরো ইসলামী সেনাবাহিনী এই নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

খায়বারের দুর্গগুলোর মাঝে বিভিন্ন দুর্গ ছিলো। তাদের বিন্যাস সমূহের বর্ণনাও আবশ্যক। খায়বারের ভৌগলিক বিন্যাস অনুসারে সেসব দুর্গের বিবরণ অনেকটা এমন; কেননা এই যুদ্ধ দুর্গের সাথেই সম্পর্কযুক্ত ছিলো যেগুলো একটার পর আরেকটা জয় করা হয়েছে। তাদের দুর্গের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদের পাশাপাশি সেগুলোর নাম সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। অধিকন্তু এই যুদ্ধের ঘটনাবলীও কিছু পুস্তকে কিছু দুর্গের দিকে আরোপ করা হয়েছে, আবার অন্যান্য পুস্তকে অন্যান্য দুর্গের দিকে এসব ঘটনাকে আরোপ করা হয়েছে।

'তারিখে ইয়াকুবি'তে খায়বারের দুর্গগুলোর সংখ্যা ছয়টি বলা হয়েছে আর এগুলোর মাঝে 'নায়েম' দুর্গের উল্লেখই নেই। অথচ অধিকাংশ সীরাতের পুস্তকে খায়বারের যুদ্ধের সূচনাই এই দুর্গ অর্থাৎ 'নায়েম' দুর্গ থেকে বলা হয়েছে। যুরকানিতে দুর্গগুলোর সংখ্যা দশটি বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তকসমূহ পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে, খায়বারের অঞ্চলটি তিনটি অংশ নাতা, শাক ও কাতিবা অংশে বিভক্ত ছিল। আর এই তিনটি অংশে আটটি দুর্গ নিম্নবর্ণিত বিন্যাস অনুযায়ী ছিল। নাতা-তে তিনটি দুর্গ ছিলো; নায়েম, সা'ব ও যুবায়ের দুর্গ। এই দুর্গটির নাম কুলা ছিলো, পরবর্তীতে এটি হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর ভাগে এসেছিলো। এজন্য এর নাম যুবায়ের দুর্গ প্রসিদ্ধ হয়। শাক-এ দুটি দুর্গ ছিল। যথা- উবাই এবং বারি। কেউ কেউ নাযার বর্ণনা করেছেন। আর কাতিবাতে তিনটি দুর্গ ছিলো। যথা- কামুস, ওয়াতি এবং সুলালিম।

যুদ্ধের বিবরণ হলো, যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শত্রুর মুখোমুখি হবার আকাঙ্ক্ষা করো না। আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিরাপত্তা কামনা করো। তোমরা জানো না যে, তোমাদেরকে কোন্ পরীক্ষায় নিপতিত করা হবে। তোমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হও তখন এই দোয়া করো যে,

اللهم انت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وانما تقتلهم انت

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুহুম ওয়া নাওয়াসিনা ওয়া নাওয়াসিহিম বিইয়াদিকা। ওয়া ইন্নামা তাকতুলুহুম আনতা)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রভু প্রতিপালক এবং তাদেরও প্রভু প্রতিপালক, তাদের ও আমাদের ভাগ্য তোমার হাতে। তুমিই তাদেরকে হত্যা করবে।

এরপর মহানবী (সা.) যুদ্ধের আদেশ দেন এবং সাহাবীদের ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। সর্বপ্রথম নায়েম দুর্গ অবরোধ করা হয়। এটা তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ ছিল।

সেদিন মহানবী (সা.) কঠিন যুদ্ধ করেন। আর 'নাতা'-র অধিবাসীরাও কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। আর সেদিন সাহাবীরাও প্রতিরক্ষা করেছিলেন। মহানবী (সা.) দু'টি বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করে রেখেছিলেন এবং 'যারেব' ঘোড়ায় আরোহন করেছিলেন। 'যারেব' মহানবী (সা.) এর ঘোড়ার নাম ছিল। আর তাঁর হাতে বর্শা ও ঢাল ছিল। শত্রুপক্ষ ক্রমাগতভাবে তির নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল। তবে মুসলমানরা সতর্কতার সাথে তির নিক্ষেপ করছিল, কারণ তাদের কাছে তির কম ছিল। বরং ইহুদীদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলিও উঠিয়ে তাদেরই ওপর নিক্ষেপ করা হতো। এ যুদ্ধে হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা-র শহীদ হবারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অস্ত্র তার নিকট ভারী বোধ হচ্ছিল। অধিকন্তু প্রচণ্ড গরম তাকে অতিষ্ট করে তুলছিল। তাই তিনি নায়েম দুর্গের দেয়ালের ছায়ায় বসে পড়েন। বলা হয়, ইহুদী সরদার মারহাব তাকে দেখে ফেলে এবং তার ওপর চাক্কি ফেলে দেয়। এটিও বলা হয় যে, কিনানা বিন রাবী' উপর থেকে তা ফেলেছিল। সেই চাক্কি তার (রা.) মাথায় লাগে এবং তার মাথাকে এমনভাবে চিরে দেয় যে, তার মাথার চামড়া কেটে গিয়ে তার মুখের উপর এসে পড়ে। তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি (সা.) চামড়াটি টেনে স্বস্থানে রাখেন এবং কাপড় দিয়ে তাতে পট্টি বেঁধে দেন। কিন্তু ক্ষত এতটাই গভীর ছিল যে, হযরত মাহমুদ বিন মাসলামার প্রাণ রক্ষা হয় নি এবং কয়েক দিন পরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। হযরত মাহমুদের আহত হবার কারণে মহানবী (সা.) তার ভাই হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে (রা.) স্বান্তনা দিয়ে বলেন, তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী অচিরেই তার পরিণামে পৌঁছে যাবে। এই প্রথম দিনে মুসলমানদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। দুর্গ হতে তির নিক্ষেপ করার কারণে পঞ্চাশ জন মুসলমান আহত হন। সন্ধ্যা হলে মহানবী (সা.) রাজী-র দিকে ফিরে যান এবং অন্যদের আদেশ দেন তারাও যেন সেখানে চলে আসে। এটি সেই স্থান যা হযরত হুব্বাব এর পরামর্শে নির্ধারণ করা হয়েছিলো। আর এখন এ স্থানটিই বলা যায় মুসলমানদের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, এটি ইহুদীদের সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। আর খায়বারের সবচেয়ে বড়ো বীর এবং প্রখ্যাত যোদ্ধা মারহাব এ দুর্গের নিরাপত্তার নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আর তার সাহায্য এমন অশ্বারোহীরা করছিল যারা বীরত্বে ও সাহসিকতায় তার চেয়ে কম ছিল না। আর এরা ছিল তার দুই ভাই ইয়াসের ও হারেস। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) ক্রমাগত দশ দিন যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে সাথে নিয়ে বের হতেন এবং শিবিরে হযরত উসমান (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রেখে যেতেন। সন্ধ্যা হলে মহানবী (সা.) সেই স্থানেই ফিরে আসতেন এবং আহত মুসলমানদেরও সেখানেই নিয়ে আসা হতো। সেখানেই তাদের ক্ষতের চিকিৎসা করা হতো।

এ যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে, মারহাবের দ্বন্দ্বযুদ্ধের এবং আমের বিন আকওয়ার শাহাদাতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, সেই দিনগুলিতে একদিন সেই দুর্গের ইহুদি সেনাপ্রধান মারহাব, যার বীরত্ব ও সাহসিকতার জুড়ি ছিল না, দুর্গ হতে বের হয়ে মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে আর অহংকার ও গর্বে নিজ তরবারি দুলিয়ে এই কবিতা পাঠ করতে থাকে যে,

قد علمت خيبر انى مرحب، شاكى الصلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب

(উচ্চারণ: কাদ আলিমাত খায়বারু আন্নি মারহাব, শাকিস সিলাহে বাতালুন মুজাররাব, ইযাল হুরুবু আকবালাত তালাহহাব)

অর্থাৎ, খায়বার জানে যে, আমি হলাম মারহাব। সশস্ত্র, সাহসী এবং অভিজ্ঞ, যখন প্রচণ্ড যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে। মারহাবের এই চ্যালেঞ্জ শুনে হযরত আমের বিন আকওয়া সৈন্যবাহিনী থেকে বেরিয়ে সামনে আসেন এবং এই রণসংগীতের পঙক্তি পড়েন,

قد علمت خيبر انى عامر، شاكى الصلاح بطل مغامر

(উচ্চারণ: কাদ আলিমাত খাইবারু আন্নি আমের, শাকিস সিলাহে বাতালুন মাগামির।)

অর্থাৎ খায়বারের অলিগলি পর্যন্ত জানে যে, আমি আমের। সশস্ত্র, সাহসী এবং যুদ্ধের বিপদাবলির স্রোতে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এরপর উভয়ে একে অপরের মুখোমুখি চলে আসে এবং একে অন্যের ওপর আক্রমণ করতে থাকে। মারহাব তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে যা হযরত আমের নিজের ঢাল দিয়ে প্রতিহত করেন এবং তৎক্ষণাৎ নীচু হয়ে নীচের দিক থেকে তার ওপর আক্রমণ করেন, কিন্তু তার (রা.) তরবারি ছোটো ছিল, যার কারণে তার (অর্থাৎ শত্রুর) গায়ে লাগার পরিবর্তে হযরত আমের-এর গায়ে নিজেরই তরবারি লাগে। এর ফলে তিনি ভীষণ আঘাত পান এবং শাহাদাত বরণ করেন। তিনি এই যুদ্ধের দ্বিতীয় শহীদ ছিলেন। তাদের দুইজনকে একই কবরে, অর্থাৎ রাজি নামক স্থানে দাফন করা হয়।

হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন যে, আমার চাচা হযরত আমের বিন আকওয়া যখন নিজের আঘাতেই শহীদ হয়ে যান তখন কতক সাহাবী বলা আরম্ভ করেন যে, আমের-এর কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেল। অতএব হযরত সালামা বলেন, এতে আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমেরের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেল। মহানবী (সা.) বলেন, একথা কে বলেছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনার কতক সাহাবী বলেছেন। তিনি (সা.) বলেন, **কাযাবা মান কালা, ইন্না লাহু লাআজরাইনে, ওয়া জামাআ বাইনা ইসবায়ি, ইন্নাহু লাজাহিদুন মুজাহিদুন। কাল্লা আরাবিয়্যুন মাশাআ বিহা মিসলাহু**। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এটি বলেছে, সে ভুল বলেছে। তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। আর তিনি (সা.) দুটি আঙুল একত্রিত করেন, অর্থাৎ দুই গণনা বুঝাতে এবং বলেন, সে তো ভীষণ জিহাদী ছিল। তার মতো এমন আরব খুব কমই আছে যে এই ভূমিতে চলাফেরা করেছে। একটি রেওয়ায়েতে 'চলাফেরা করেছে' শব্দের স্থলে এই শব্দ রয়েছে যে, 'জন্মগ্রহণ করেছে'। অর্থাৎ আমের-এর মতো কোনো আরব জন্মগ্রহণ করে নি। তিনি (সা.) বলেন, সে তো দুটি পুরস্কার নিয়েছে। যারা বলে, তিনি কোনো প্রতিদান পান নি, তারা ভুল বলে। মহানবী (সা.) রাজি নামক স্থানেই অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই নায়েম দুর্গ জয় করার লক্ষ্যে একাধারে দশ দিন সাহাবীদের প্রেরণ করতে থাকেন। বার বার এমন ব্যর্থতা, সাহাবীদের আহত হওয়া এবং দুইজন সাহাবীর শহীদ হবার ঘটনায় ইহুদীদের সাহস আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশেষে এক রাতে মহানবী (সা.) বলেন, আগামীকাল আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেবো যার হাতে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। হযরত বুরায়দা বর্ণনা করেন যে, আমরা সেই রাত অত্যন্ত আনন্দের সাথে অতিবাহিত করি এই ভেবে যে, আগামীকাল বিজয় লাভ হবে। আর লোকেরা এটি ভেবে রাত কাটায় যে, আগামীকাল কাকে পতাকা প্রদান করা হবে! অতঃপর ভোর হলে সবাই মহানবী (সা.)-এর নিকট একত্রিত হয়। প্রত্যেকে এই আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পোষণ করছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। হযরত উমর বর্ণনা করেন যে, আমি সেই দিনের পূর্বে কখনো নেতৃত্ব পাওয়াকে পছন্দ করি নি। হযরত বুরায়দা বর্ণনা করেন যে, আমাদের মাঝে কেউই মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কোনো মর্যাদা লাভের আশা কখনো করে নি, কিন্তু সেদিন সবাই এই আশা করছিল যে, আজ এই পতাকা তাকে

দেওয়া হোক। এমনকি তিনি বলেন, আমি গোঁড়ালিতে ভর করে উঁচু হয়ে দাঁড়াই এবং মাথা উঁচু করি এই ভেবে যে, হয়ত আমাকে পতাকা দেওয়া হবে। হযরত সালামা এবং হযরত জাবের বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.) থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। খায়বার সফরে অসুস্থতার কারণে তিনি সাথে আসতে পারেন নি, কিন্তু পরবর্তীতে অস্থির হয়ে চলে আসেন। তার চোখে ভীষণ ব্যথা ছিল এবং তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। মহানবী (সা.) যখন খায়বারের জন্য রওয়ানা হন তখন হযরত আলী (রা.) ভাবেন, আমি মহানবী (সা.)-এর পিছনে থেকে যাব, এটি কীভাবে হতে পারে? অতএব হযরত আলী (রা.) পিছনে পিছনে আসতে থাকেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত বুরায়দা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) ভোরে ফজরের নামায আদায় করেন, অতঃপর পতাকা আনিয়ে নেন এবং দাঁড়িয়ে যান আর মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, এরপর বলেন, আলী কোথায়? সাহাবীরা (রা.) বলেন, আলীর চোখে ব্যথা রয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আলীকে ডাকো। হযরত সালামা বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে আসলে মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, (তোমার) চোখের কী হয়েছে? হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন যে, আমার চোখে ব্যথা, এমনকি আমি সামনের কোনো জিনিসও দেখতে পাচ্ছি না। মহানবী (সা.) বলেন, আমার নিকটে এসো। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমার মাথা তিনি (সা.) তাঁর কোলে রাখেন এবং তাঁর হাতে মুখের লালা নিয়ে আমার চোখের ওপর লাগিয়ে দেন। এতে হযরত আলী (রা.) এমনভাবে আরোগ্য লাভ করেন, যেন তাঁর চোখে কখনো কোনো কষ্ট ছিলই না। এরপর আমৃত্যু তাঁর চোখে কখনো কোনো কষ্ট দেখা দেয় নি। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর জন্য দোয়া করেন এবং তাঁর হাতে পতাকা দেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

খায়বারের দিন হযরত আলী (রা.)-এর সুযোগ হয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আজ আমি তাকে সুযোগ দেবো যে আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ্ তা'লাও যাকে ভালোবাসেন। আর তরবারি তার হাতে তুলে দেবো যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাধান্য দান করেছেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম আর নিজের মাথা উঁচু করছিলাম, যেন মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি আমার ওপর পড়ে এবং তিনি আমাকে তা দান করেন। কিন্তু মহানবী (সা.) দেখতেন আর নীরব থাকতেন। আমি পুনরায় মাথা উঁচু করতাম। তিনি (সা.) পুনরায় দেখতেন এবং নীরব থাকতেন। এমনকি হযরত আলী (রা.) আসেন, তাঁর চোখে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আলী সামনে এসো। তিনি তাঁর (সা.)-এর কাছে আসেন। তখন তিনি (সা.) মুখের লালা তার চোখে লাগিয়ে দেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমার চোখকে আরোগ্য দান করুন, এই তরবারি নাও, যা আল্লাহ্ তা'লা তোমার কাছে সোপর্দ করেছেন। আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

একদিন মহানবী (সা.)-কে খোদা তা'লা জানিয়েছেন যে, এই শহরের বিজয় হযরত আলীর হাতে নির্ধারিত। তিনি (সা.) সকালে এই ঘোষণা করেন যে, আমি ইসলামের কালো পতাকা আজকে তার হাতে প্রদান করব যাকে খোদা তা'লা ও তাঁর রসূল এবং মুসলমানরা ভালোবাসে। এই দুর্গের বিজয় খোদা তা'লা তার হাতে নির্ধারিত করেছেন। এরপর দ্বিতীয় দিন সকালে তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডাকেন এবং তার হাতে পতাকা তুলে দেন, যিনি সাহাবীদের সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে দুর্গের ওপর আক্রমণ করেন। ইহুদীরা দুর্গের ভেতরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবীকে সেদিন এমন শক্তি

প্রদান করেছিলেন যে, সন্ধ্যার আগেই দুর্গ জয় হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.) পতাকা নিয়ে দৌড়ে এসে সেই দুর্গের নীচে পৌঁছেন আর পতাকা পাথরের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেন।

শত্রুদের হত্যা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত জাবের বর্ণনা করেন, খায়বারের দুর্গ সমূহ থেকে সর্বপ্রথম মারহাবের ভাই হারেস দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য বের হয় এবং হযরত আলী তাকে হত্যা করেন। তখন হারেসের সঙ্গীরা দুর্গে ফিরে যায়। এরপর ইহুদী সেনাপতি আমেরের হত্যা রয়েছে। আমের দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য বের হয় এবং সে বিশালদেহী মানুষ ছিল। হযরত আলী তার সাথে যুদ্ধ করতে বের হন এবং তাকে বেশ কয়েকটি আঘাত করেন, কিন্তু কোনোটিই কার্যকর হয় নি। অতঃপর হযরত আলী তার পায়ের গোছায় আক্রমণ করেন তখন সে বসে পড়ে। তারপর তিনি তাকে হত্যা করে তার অস্ত্র নিয়ে নেন। আরেক ইহুদি জেনারেল উসায়েরের হত্যার ঘটনা (লিপিবদ্ধ) আছে। আরেক ইহুদী সেনাপ্রধান উসায়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বের হয়। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার মোকাবিলার জন্য সম্মুখে এগিয়ে আসেন এবং তাকে হত্যা করেন। মারহাবের ভাই ইয়াসের নিহত হয়। ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, এরপর ইয়াসেরের উদয় ঘটে, যে ছিল মারহাবের ভাই আর সে রণ-সঙ্গীত পাঠ করছিল। মুহাম্মদ বিন উমর লিখেছেন যে, সে তাদের মাঝে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল আর তার কাছে (এমন) যুদ্ধাস্ত্র ছিল যা দিয়ে সে লোকজনকে পিষে ফেলতো। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হযরত আলী (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হন। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম তাকে বলেন, আমি কসম দিচ্ছি, আপনি আমার ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেন না। অর্থাৎ, তিনি বলেন যে, আমি তার সাথে লড়াই করব। তখন হযরত আলী (রা.) পিছনে সরে যান। হযরত যুবায়ের (রা.) যখন সেই কাফেরের দিকে অগ্রসর হন তখন তার মা হযরত সাফিয়া (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সে আমার সন্তানকে হত্যা করে ফেলবে! মহানবী (সা.) বলেন, বরং আপনার পুত্র ইনশাল্লাহ্ তাকে হত্যা করবে। হযরত যুবায়ের (রা.) তার দিকে যান এবং কিছু পঙক্তি পাঠ করেন। এরপর তাদের উভয়ের মাঝে লড়াই হয় আর হযরত যুবায়ের তাকে হত্যা করেন।

অতঃপর দুর্গ থেকে খায়বারবাসীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহসী যোদ্ধা মারহাব নিজ অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে বের হয় আর এই পঙক্তি পাঠ করতে থাকে, যা সে পূর্বেও পড়েছিল যে,

খায়বার জানে, আমি মারহাব, সশস্ত্র, সাহসী ও অভিজ্ঞ। যখন প্রচণ্ড যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হয়।

তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.) বের হন আর তিনি লাল রংয়ের একটি জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তিনি তরবারি বের করেন আর এ পঙক্তি পাঠ করেন,

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَةٌ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَةِ

أُفِيهِم السَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ

অর্থাৎ, আমি সেই সত্তা যার নাম তার মা হায়দার রেখেছেন, ভয়ানক দেহের অধিকারী বাঘের ন্যায় যে জঙ্গলে থাকে, আমি এক সা-এর পরিবর্তে সান্দারা প্রদান করে থাকি। এটি একটি বাগধারা যার অর্থ হলো, শের এর ওপর সোয়া শের অথবা ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়া। সান্দারার শাব্দিক অর্থ একটি বড় পরিমাপক আর সা কিছুটা কম হয়ে থাকে, প্রায় আড়াই সের পরিমাণ। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) মারহাবের মাথায় আঘাত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তখন তার (রা.) হাতে বিজয় অর্জিত হয়।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) ও মারহাবের মাঝে লড়াই হয়। হযরত আলী সামনে অগ্রসর হয়ে মারহাবের ওপর একটি আঘাত করেন যা তার মাথা ও শিরস্ত্রাণ ভেদ করে তার দাঁত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। এরপর লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে এগিয়ে যায় আর এভাবে তারা দুর্গ জয় করেন।

কতিপয় জীবনীকার বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) মারহাবকে হত্যা করেছিলেন। অতএব হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মারহাব যখন তার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করতে করতে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে আর সে রণ-সঙ্গীত পাঠ করছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আল্লাহ্‌র কসম! সে গতকাল আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তিনি (সা.) বলেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হও এবং বলেন, হে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করো। বর্ণিত হয়েছে যে, উভয়ে যখন লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে একে অপরের নিকটবর্তী হয় তখন তাদের দুজনের মাঝে একটি পুরাতন গাছ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। উভয়ে একে অপরের কাছ থেকে সেই গাছের আঁড়াল নিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকে। যখনই তাদের কোনো একজন গাছের আঁড়ালে আশ্রয় নিত তখন আরেকজন অপর দিক থেকে সেই গাছের কোনো না কোনো অংশ কেটে দিত। এভাবে একসময় তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে যায়। অতঃপর মারহাব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে। তখন তিনি নিজেকে ঢাল দ্বারা রক্ষা করেন। মারহাবের তরবারি ঢালের মাঝে আটকে যায় আর ঢাল কেটে যায়। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তখন তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেন। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা মারহাবকে আঘাত করেন এবং তার পা কেটে দিলে সে পড়ে যায়। এরপর হযরত আলী (রা.) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হত্যা করেন।

বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনে হাজার লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাক, মূসা বিন উকবা, ওয়াকদী এবং আরও অনেক জীবনীকার লিখেছেন যে, মারহাবকে মুহাম্মদ বিন মাসলামা হত্যা করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা মারহাবের ভাই হারেসকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু কতিপয় বর্ণনাকারী সংশয়ে নিপতিত হন আর তারা হারেসের পরিবর্তে মারহাবের নাম লিখে দেন। আর বিষয়টি যদি এমন না হয় তবে সহীহ মুসলিমে যা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী মারহাবকে হত্যা করেছেন তা অন্য বর্ণনাগুলোর চেয়ে নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। সহীহ মুসলিমে হযরত সালামা বিন আকওয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.)ই মারহাবকে হত্যা করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত দু'টি কারণে অগ্রগন্য। প্রথমত সেটি সনদের দিক থেকে সহীহ বা বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়ত হযরত জাবের (রা.), যিনি মুহাম্মদ বিন মাসলামা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, (তিনি) খায়বারের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, মারহাব এবং তার পাশাপাশি অন্য ইহুদীদের দ্বন্দযুদ্ধ এবং হত্যার ঘটনাগুলো কোন্ দুর্গে সংঘটিত হয়েছিল– সে সম্পর্কে ইতিহাস এবং জীবনচরিত গ্রন্থগুলোতে মতপার্থক্য রয়েছে। বুখারী, মুসলিম, সিহাহ সিত্তা প্রভৃতিতে কোনো দুর্গের নাম উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে কিছু জীবনচরিত গ্রন্থ এই ঘটনা উল্লেখ করেছে, তবে নির্দিষ্ট কোনো দুর্গের উল্লেখ করে নি। যেমন, সীরাত ইবনে হিশাম, তাবকাত ইবনে সাদ, শারাহ যুরকানী প্রভৃতি। যদিও কিছু গ্রন্থে এসব ঘটনাকে কামুস দুর্গের প্রতি আরোপ করা হয়েছে এবং কতকে নায়েম দুর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক নয়

দিন পর্যন্ত মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে এই দুর্গের ওপর আক্রমণ করতে থাকেন। এমনকি দশম দিনে আল্লাহ্ তা'লা এই দুর্গের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। মুসলমানদের নায়েম দুর্গ দখলের বর্ণনায় কোনো ঐতিহাসিক এই বিষয়টি উল্লেখ করেন নি যে, এই দুর্গ বিজয়ের সময়, যা খায়বারের সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, মুসলমানরা কী পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং কী পরিমাণ অস্ত্রসস্ত্র লাভ করেছে। হতে পারে যে, মুসলমানরা কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিসই প্রাপ্ত হয় নি, কেননা ইহুদীরা জরুরী পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নারী ও শিশুদের পূর্বেই অন্য দুর্গে স্থানান্তরিত করে দিয়েছিল। আর যখন ইহুদীরা পরাজিত হয় এবং নায়েম দুর্গে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় তখন তারা নিজেরাও সহজেই সাদ বিন মুআয দুর্গে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর নায়েম দুর্গের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনো একজন ইহুদীও মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় নি। এর আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে অবশিষ্ট দুর্গসমূহের ঘটনাবলী (বর্ণনা করা হবে)।

আমি যেমনটি পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে এবং মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে দোয়ার জন্য বলে থাকি, ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য বিশেষভাবে এবং সার্বজনীনভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে বাহ্যত এমন মনে হয়, মানুষজন আনন্দিত যে, যুদ্ধবিরতি হলে হয়তবা (অবস্থার) উন্নতি হবে। কিন্তু (অবস্থা) মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে। আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের নীতি ও পরিকল্পনা অত্যাচারের আরেক চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। পূর্বে তো আমেরিকানরা বলত, সে আমাদের দেশের জন্য বিপজ্জনক, বহির্বিশ্বে নাক গলায় না, কিন্তু এখন তো সে সারা বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনবাসীর প্রতি কৃপা করুন এবং বিশ্বের প্রতি কৃপা করুন আর এসব থেকে তাদের রক্ষা হোক। আরব বিশ্ব এখনও নিজেদের চোখ খুলুক এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালাক, এছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। নতুবা শুধুমাত্র ফিলিস্তিনই নয়, বাকি আরব দেশগুলোও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। যদিও এখন কতিপয় অমুসলিমদের পক্ষ থেকেও ফিলিস্তিনবাসীদের পক্ষে অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ উচ্চকিত হচ্ছে, কিন্তু ক্ষমতাধররা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ক্ষমতার নেশায় মত্ত রয়েছে। তারা কারো কথায় কান দিতে চায় না। অতএব মুসলমানদের অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আর আমাদেরও তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। আমাদের কাছে তো আর কোনো শক্তি নেই।

অনুরূপভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। তাদের অবস্থাও কোনো কোনো দিন কখনো কখনো বিরোধিকার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল প্রকার বিরোধিতা এবং আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন। অন্যান্য স্থানের নিপীড়িত মানুষদের জন্যও দোয়া করুন। নির্যাতিত আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নিজ সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় আবৃত রাখুন। বিশ্ববাসীকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের সবার মনোযোগ নিবদ্ধ হোক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)